DEPT-POLITICAL SCIENCE

POL-H-CC-T-3(SEM-2ND)

UNIT-4

CHARACTERISTICS OF THE ELECTORAL SYSTEM IN INDIA

২৭.৪ ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Electoral System in India)

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হল নির্বাচন। গণতন্ত্রের সাফল্য সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল করার জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থার কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) প্রত্যক্ষ নির্বাচন ∫∫ ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা মূলতঃ প্রত্যক্ষ। তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থাও আছে। লোকসভা এবং রাজ্য-বিধানসভাগুলির সদস্যরা নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। লোকসভা এবং রাজ্য-বিধানসভাগুলি হল জনপ্রিয় কক্ষ। এই দুটি কক্ষ জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। তার ফলে নির্বাচক ও প্রতিনিধিদের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিদের উপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। তার ফলে প্রতিনিধিদের দায়িত্বশীলতা রক্ষা করা যায়।

পরোক্ষ নির্বাচন ∫∫ তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থাও আছে। রাজ্যসভার সদস্যরা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। রাজ্যের বিধানপরিষদের সদস্যদের এক-দ্বাদশাংশ স্নাতকদের ভিতর থেকে এবং এক-দ্বাদশাংশ শিক্ষকদের ভিতর থেকে নির্বাচিত হন। ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতিও পরোক্ষভাবে নির্বাচিত ।

(২) সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ∫∫ সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সরকারকে প্রকৃত বিচারে গণতান্ত্রিক সরকার বলা যায় না। এ ধরনের সরকার সমাজের একটি বিশেষ অংশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। এই সরকার জনগণের সকল অংশের প্রতিনিধিপুষ্ট সরকার হতে পারে না। যথার্থ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হল সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার। এই নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের সরকার গঠিত হয়। ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা এ বিষয়ে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই সংবিধানের ৩২৬ ধারায় সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার (Universal Adult Suffrage) স্বীকার করা হয়েছে। ভারতে বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক পদে নির্বাচনের জন্য জনসাধারণকে যে ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে তা কোন বিশেষ যোগ্যতার ভিত্তিতে দেওয়া হয় নি। ধনী-দরিদ্র, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, জন্মস্থান নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়স্ক সকল নাগরিককে ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে। সংবিধান ও আইন অনুসারে ভোটাধিকার প্রয়োগের অযোগ্য বিবেচিত না হলে ১৮ বছর বয়স্ক সকল নাগরিক নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন।

(৩) মাথাপিছু একটি ভোটের নীতি ∫∫ ভারতে প্রত্যেকের জন্য সমান ভোটাধিকারের নীতি স্বীকার করা হয়েছে। এখানে সকলে মাথাপিছু একটি ভোট দেওয়ার অধিকার (principle of one man one vote) ভোগ করেন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একজন সাধারণ নাগরিকের কোন পার্থক্য নেই। লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচনে কোন নাগরিকই একাধিক ভোট প্রয়োগ করতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের কোন ব্যতিক্রমের সংস্থান সংবিধানে স্বীকার করা হয় নি।

(৪) সমপ্রতিনিধিত্বের নীতি ∫∫ ভারতে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে সমসংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। লোকসভা এবং রাজ্য-বিধানসভাগুলির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমানুপাতের নীতি অনুসরণ করা হয়। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। বিধানসভার সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে যতজন নাগরিকপিছু একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন সেই সংখ্যাগত অনুপাত সমগ্র দেশে একই। লোকসভার সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এই সমানুপাতের নীতি মেনে চলা হয়। সমানুপাতের নীতির ভিত্তিতে নির্বাচনী এলাকাগুলি নির্দিষ্ট করা হয়। লোকসভার সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সমগ্র দেশকে কতকগুলি নির্বাচন-এলাকায় (territorial constituencies) বিভক্ত করা হয়। তেমনি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট রাজ্যটিকে কতকগুলি নির্বাচন-এলাকায় বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার মোট ভোটার সংখ্যার মধ্যে যথাসম্ভব সমতা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

(৫) অনগ্রসর জাতিগুলির জন্য আসন সংরক্ষণ ∫∫ ভারতের প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা হল আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা (territorial constituency)। জনসংখ্যার ভিত্তিতে এগুলি নির্দিষ্ট করা হয়; পেশা বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নয়। তবে ভারতে তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতি (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) এবং ইঙ্গ-ভারতীয় (Anglo-Indian) সম্প্রদায়ের জন্য অস্থায়িভাবে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে আসন সংরক্ষণের এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। লোকসভায় তফসিলী জাতির জন্য ৭৯টি আসন এবং তফসিলী উপজাতির জন্য ৪০টি আসন সংরক্ষিত আছে। রাজ্য

বিধানসভাগুলিতে তফসিলী জাতির জন্য মোট ৫৫৭টি আসন এবং তফসিলী উপজাতির জন্য মোট ৩৩৭টি আসন সংরক্ষিত আছে। ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্যও এই সংরক্ষণের সুযোগ আছে। রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে লোকসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় থেকে অনধিক দু'জন সদস্যকে মনোনীত করতে পারেন। তবে আইনসভায় আসন সংরক্ষণের এই ব্যবস্থা অস্থায়ী। এই ব্যবস্থা ২০১০ সালের ২৫শে জানুয়ারি পর্যন্ত কার্যকর থাকার কথা ছিল। ২০১০ সালে ৯৫তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই সংরক্ষণের মেয়াদ ২০২০ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত বাড়ান হয়েছে।

(৬) **নির্বাচন প্রার্থী** // ভারতে রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি নির্বিশেষে নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নাগরিকদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের স্বার্থে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যে-কোন রাজনৈতিক পদ লাভের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে সমানাধিকার দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার জন্য কোন আর্থিক, শিক্ষাগত বা অন্য কোন যোগ্যতার কথা বলা হয় নি।

(৭) **নির্বাচনী ব্যয় সীমাবদ্ধ** // ভারতে নির্বাচন-প্রার্থীদের অর্থব্যয়ের বিষয়টি সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুসারে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক নির্বাচন প্রার্থী কত অর্থ ব্যয় করতে পারবেন তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক নির্বাচন-প্রার্থীকে তার নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব পেশ করতে হয়। এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা করতে হয়। প্রত্যেক প্রার্থীকে অর্থব্যয়ের সীমা মেনে চলতে হয়। কোন প্রার্থীই এই সীমার অধিক অর্থ ব্যয় করতে পারেন না। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা যাতে যথাসম্ভব সততার ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নির্বাচনী ব্যয়ের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের উপরে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই // কিন্তু কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে পারবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে। নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির অর্থব্যয়ের উপর কোন বাধা-নিষেধ না থাকায় বৃহৎ রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ছোট দলের প্রার্থী এবং নির্দল প্রার্থীদের তুলনায় অধিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন। নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনী তহবিল গঠন করে এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থার কাছ থেকে এই তহবিলে মোটা অংকের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করে। এর পরিণতিতে সরকার ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ক্রীড়নকে পরিণত হয়। কারণ আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলি নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য ক্ষমতাসীন দলীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং তা আদায় করে। দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কালোবাজারী, মুনাফাবাজী, ভেজালদারী প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। নানারকম অর্থনৈতিক সমস্যা ও সংকটের সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার হয়ে পড়ে। কিন্তু বদান্যতার কারণে দলীয় সরকার তা করতে পারে না। তার ফলে দেশবাসীকে আর্থিক দুর্গতি ভোগ করতে হয়। নির্বাচন-প্রার্থীদের ব্যয়ভার সরকার বহন করলে এবং নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির অর্থব্যয় আইন করে নিষিদ্ধ করে দিলে এই সমস্ত সমস্যাদির সহজেই সমাধান সম্ভব হবে।

(৮) **নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন** // অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন সংস্থা ছাড়া নির্বাচন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়া সম্ভব নয়। নির্বাচন ব্যবস্থা পক্ষপাতদুষ্ট হলে শাসকদলের মধ্যে দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে ভারতের সংবিধানের রচয়িতারা সতর্ক ছিলেন। তাই অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মত ভারতেও নির্বাচন সম্পর্কিত দায়দায়িত্ব আইন-বিভাগ বা শাসন-বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হয় নি। সংবিধানের ৩২৪ ধারা অনুসারে নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার দায়িত্ব ও ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের উপর।

(৯) **নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধ মীমাংসা** // ভারতে নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব আদালতের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। মূল সংবিধানে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গঠিত একটি নির্বাচনী ট্রাইবুন্যালের হাতে। ১৯তম সংবিধান সংশোধন (১৯৬৬)-এর মাধ্যমে এই ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। এবং নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধ বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হয় হাইকোর্টকে। ৩৯তম সংবিধান সংশোধনে (১৯৭৫) এ বিষয়ে কিছু পরিবর্তন করা হয়। বলা হয় যে রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং লোকসভার স্পীকার এই সমস্ত পদাধিকারীদের নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষমতা আদালতের হাতে থাকবে না। এই বিরোধ নিষ্পত্তি করবে পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটি কর্তৃপক্ষ। এই সংশোধনী আইনে আরও বলা হয় যে সংশ্লিষ্ট আইন ও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না। ১৯৭৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচনের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলা হয়। সেই মামলায় শ্রীমতী গান্ধী পরাস্ত হন। তারপর এই সংশোধনী আইন প্রণীত হয়। যাইহোক

৪৪-তম সংবিধান সংশোধন (১৯৭৮)-এর মাধ্যমে ৩৯-তম সংবিধান সংশোধনের এই ব্যবস্থাকে বাতিল করা হয় এবং আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়।

(১০) ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণ নেই // ভারত হল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে সকল ধর্মই রাষ্ট্র ও আইনের চোখে সমান। তাই আইনসভায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় নি। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে এ দেশে এ ধরনের ব্যবস্থা ছিল। ইংরেজ সরকার ভারতবাসীর মধ্যে অনৈক্য ও বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য এই ব্যবস্থা করেছিল।

(১১) নির্বাচক ও নির্বাচন প্রার্থীদের বয়স // ভারতে নির্বাচক ও নির্বাচন-প্রার্থীদের ন্যূনতম বয়সের মধ্যে পার্থক্য আছে। ১৮ বছর বয়স হলেই নাগরিকরা ভোট দিতে পারেন। কিন্তু লোকসভা এবং রাজ্য-বিধানসভায় নির্বাচন প্রার্থীর বয়স হতে হবে কমপক্ষে ২৫ বছর। অপরপক্ষে রাজ্যসভা এবং রাজ্য-বিধান-পরিষদের নির্বাচন প্রার্থীর বয়স হওয়া চাই অন্তত ৩০ বছর।

(১২) ভারতে নির্বাচনই হল যে-কোন রাজনৈতিক পদে আসীন হওয়ার একমাত্র উপায় বা পদ্ধতি। অন্য কোনভাবে কোন রাজনৈতিক পদ পাওয়া যায় না। তবে রাজ্যসভা এবং রাজ্য বিধান-পরিষদগুলিতে সীমিত সংখ্যক প্রতিনিধি মনোনয়নের ব্যবস্থা আছে।

(১৩) ভারতের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। জাতীয় ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন দলীয় প্রতীক বরাদ্দ করে। দলীয় প্রার্থীরা দলীয় প্রতীক নিয়েই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তবে নির্দল প্রার্থী হিসাবেও ব্যক্তি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।

(১৪) ভারতে নির্বাচনগুলির ফলাফল সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। এ ক্ষেত্রে কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় না। তবে রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি আছে।